‘পশ্চিমা কর্পোরেট ল্যাবের তত্ত্ব বিজ্ঞান, আমাদের কৃষকের জ্ঞান বিজ্ঞান নয়, এটা হতে পারে না বিজ্ঞান একটিই’

ফরহাদ মজহার

ফরহাদ মজহার পত্রপত্রিকায় লড়াকু তার্কিক। মাঝে মধ্যে হয়ে ওঠেন তাত্ত্বিক। কিন্তু তার প্রাথমিক পরিচয় কবি ও নাট্যকার। পড়াশোনায় ফার্মাসিস্ট, ভালোবাসেন অঙ্ক। কার্ল মার্কসের প্রতি একনিষ্ঠতা আছে, এদিকে লালনের আধ্যাত্মিকতায় বাঙালির জীবনকে খুঁজে পান। কিন্তু তার আসল কাজটি হলো বিজ্ঞানীর, কৃষি বিজ্ঞানী। এখন এগিয়ে এসেছেন জৈবিক চাষের প্রথম সারির প্রবক্তা হিসেবে। এখনকার অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্বফোরামে বিতর্কে যাচ্ছেন করপোরেট ল্যাবের দখল থেকে জমি ও প্রকৃতিকে মুক্ত করতে। এ তর্কে বিজ্ঞান তার হাতিয়ার। তিনি মনে করেন, গ্রামীণ কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কথা বলে সংলাপ মতবিনিময়ের মাধ্যমে। কৃষকরাই গড়ে তুলেছে নয়া কৃষি। সব বিষয়েই সংলাপ প্রয়োজন। কিন্তু উপরিকাঠামোয় বিতর্ক হয় না। সমস্যা এড়িয়ে না গিয়ে মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন, সংলাপের মাধ্যমেই সমাধান হতে পারে।

নয়া কৃষির ১২টি সংগঠন এখন দেশে। স্ত্রী ফরিদা আখতার সমান্তরালভাবে তার এই কঠিন কাজে সহযাত্রী। তিনি মনে করেন, ফরিদা তাকে স্থিতি দিয়েছেন জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, চিন্তা-চেতনায়।

ফরহাদ মজহার ’৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধই একজন ফার্মাসিস্টকে নিয়ে গেছে এই নতুন যুদ্ধক্ষেত্রে। পঞ্চাশের শেষ প্রান্তে এসে মনে করেন, তার জীবনকালেই অনেক বদলে দিতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা, স্বাপ্নিক কবি ও বিজ্ঞানীর উচ্চাশা এটাই তো হওয়া উচিত। পাঠক দেখুন এক মত হতে পারেন কিনা। আপনারাও সংলাপে আসতে পারেন বিষয় ভিত্তিতেই, অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান যুক্তিতে। ষাটের দশকের শেষ থেকে ফরহাদ মজহারকে নানা ভূমিকায় দেখা গেছে। কোনোটিতেই স্থির থাকেননি। এখন, পনেরো বছর ধরে তিনি নয়া কৃষি নামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, কৃষি আন্দোলন। ... কৃষি বিজ্ঞানী **ফরহাদ মজহারের** সঙ্গে **শাহাদত চৌধুরীর** সাক্ষাৎকার

শাহাদত চৌধুরী : ফরহাদ মজহার, আপনার অনেকগুলো বিষয় নিয়ে চর্চা, চিন্তা-ভাবনা। আপাতত আপনার পেশা দিয়ে শুরু করি। আপানার পেশা কি?

ফরহাদ মজহার : পেশা মানে আমি নিজেকে কিভাবে দেখতে চাই, সেটা বলি। আমার মাঝে দুটো জিনিস আছে। এক. আমার ভেতর একজন বিজ্ঞানী কাজ করে সারাক্ষণ। প্রথাগত অর্থে যে বিজ্ঞানী বলি তা নয়। যে বিজ্ঞানী অনেক বেশি কাব্যিক এবং কাল্পনিক। যে কল্পনাকে, স্বপ্নকে অনেক গুরুত্ব দেয়। একই সঙ্গে ধাপে ধাপে একটা জ্ঞানকে তৈরি করে, তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে এটাও একই সঙ্গে স্বীকার করে। যে জ্ঞানের জন্য বা নতুন জ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এর জন্য কল্পনার ভূমিকা আছে। আপনি আমাকে বিজ্ঞানী বলতে পারেন এক শব্দে। কিন্তু কবিতাও তো

ছাড়তে পারছি না। তার জন্য চর্চার অংশ নিতে হয়েছে।

শা. চৌ : তার মানে দ্বিতীয় পরিচয় হলো কবি। আমরা আপাতত বিজ্ঞানেই থাকি। কবিতায় পরে যাবো। আপনার মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার এই যে উপলব্ধি এর অনুপ্রেরণা কোথা থেকে আপনি পাচ্ছেন, বা আপনার গোড়ার জায়গা কোথায়?

ফ. ম : আমার শিক্ষা পড়াশুনা তো বিজ্ঞানী হিসেবে। বিদেশে পড়াশোনা, দেশে ওষুধ বিজ্ঞানে পড়েছি। আর আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিলো গণিতে। বাইরে যখন গেছি আবারো পড়াশোনা করেছি, ফার্মাসিস্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছি। তারপর আবার অর্থনীতিতে পড়েছি। মনে হয়েছে এই শাখাগুলো সম্পর্কে জানা দরকার। প্রয়োগ যখন করতে এসেছি বাংলাদেশে তখন ভাবতে হয়েছে যদি বাংলাদেশে করি তবে কোন ক্ষেত্রে কাজ করলে একেবারে সামনের সীমান্তে থেকে কাজ করতে পারবো। মানে বিজ্ঞানের কোন সীমান্তে কাজ করলে আমি মৌলিক কিছু করতে পারবো। যে কাজটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদানও রাখতে পারবে। আমি কখনো কিন্তু শুধু দেশীয়, স্বদেশী জায়গা থেকে চিন্তা করি নাই। এটাই আমার কাজের ক্ষেত্র, আমি এটিকে বেসিক বলে কাজ শুরু করি।

‘মানুষগুলোকে কি নিয়ে এগুতে হবে। আমরা একটা রাষ্ট্র গঠন করেছি, দেশ পেয়েছি, জনগোষ্ঠী আছে, আবার আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা কি হবো আগামী ২০-৫০ বছরে?’

শা. চৌ : এ দেশের মানুষজনকে নিয়ে ভাবেননি?

ফ. ম : মানুষজনকে নিয়ে অবশ্যই ভেবেছি। গরিব মানুষ। তার একটা শ্রেণীগত দিক ছিলো, অন্যদিকে মনে একটা ব্যথাও ছিলো। ব্যথাটা কি রকম। ’৭২-এ যখন শুনলাম, আমাদের দেশ বাস্কেট কেস। ’৭০-এর শেষ থেকে ’৮০ দশকের শুরুর দিকে কিছু মানুষ যখন কাজ করতে গেলো মধ্যপ্রাচ্যে, বাইরে তখন তাদের মিসকিন বলা হলো। আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে। তখন মনে হলো আমাকে একটা কাজ করতে হবে যাতে আমরা দেখাতে পারি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে এমন একটা জায়গায় কাজ করতে চাই, যেটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একেবারে সামনের সীমান্তের কাজ। তখনই আমি কৃষি, বায়োডাইভারসিটি, ইকোলজি নিয়ে আগ্রহী হয়েছি। এবং যাতে দারিদ্র্যের কারণটায় পৌঁছাতে পারি। কারণ এটা তখন ফ্রন্ট লাইনের কাজ। এটা নিয়ে বাংলাদেশে তখন কোনো কাজই শুরু হয়নি। পরিবেশ নিয়ে কেউ হয়তো কথাবার্তা বলছিলো। তখন মানুষ পরিবেশ বলতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বুঝতো এবং বিদেশী প্রেসক্রিপশন মতো চলতো। পরিবেশ বলতে এখন আমরা যেটা বুঝি সেটা তখন ছিলো না। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কনভেনশনাল অব বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি নিয়ে চিন্তা-চেতনা শুরু হয়েছে। প্রাণবৈচিত্র্য নিয়ে কথাবার্তা চলছে। বায়োলজিক্যাল বিজ্ঞানে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে। এগুলো আমাকে প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি দেশে চলে আসি। এখানে এসে একটা কাজের ক্ষেত্র খুঁজেছি যেখানে আমার চিন্তাগুলো প্রয়োগ করতে পারি।

শা. চৌ : এখানে একটা জিনিস মনে হতে পারে, এটাকে আপনি কেবল কর্মক্ষেত্র হিসেবে দেখছেন? অর্থাৎ পাশ্চাত্যে যেমন বিজ্ঞানের ধারণায় প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে আমাদের বেছে নেয় ব্যাপারটাকে এভাবে যদি দেখতে চাই?

ফ. ম : অবশ্যই না। এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের গড়ে উঠবার মৌলিক দর্শনগত যে সংকট ওটা আমার চোখে পড়েছে। ওয়েস্টার্ন সায়েন্স একটা ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে ইউরোপ ও বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি হচ্ছে বা হয়েছে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে স্পিরিট বলতে এখন আমরা যা বুঝি এটার মধ্যে একটা ফারাক রয়ে গেছে। পশ্চিমে বিজ্ঞান বলতে এখন বোঝায় কর্পোরেট সায়েন্স। আগের যে স্পিরিট জানবার জন্য, জ্ঞানের জন্য সবার প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য সেটা এখন নাই। এখন কোম্পানির মুনাফার জন্য ব্যবহার হচ্ছে বিজ্ঞান। আমি কঠিন অবস্থান থেকে কাজ শুরু করলাম। যাতে সত্যিকার মানুষের তৃষ্ণা মেটানো এক জিনিস এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞানের আগের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সকল মানুষের উন্নতির জন্য গবেষণা দুটো উদ্দেশ্য ছিল। একটা দার্শনিক। পশ্চিমের বিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণাকে প্রশ্ন করা। দুই নম্বর ছিল রাজনৈতিক। বিজ্ঞানের কর্পোরেট চরিত্রকে প্রশ্ন করতে হবে। তিন নম্বর আমি বলবো ইনডেজিনাস।

এক ধরনের বিশ্বাস মনের মধ্যে আছে যে এটা হতে পারে না- পশ্চিমারাই সব জ্ঞান দান করবে, আমার দেশের মানুষের মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই। এটা কোনভাবেই হতে পারে না। এই রেসিজম বা ধারণাকে প্রশ্ন করলে একই সঙ্গে বর্ণবাদকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষক যদি ১৫ হাজার জাতের ধান উৎপাদন করতে পারে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার কিছু বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ছিল। এ বিজ্ঞান আমার আগের পূর্বপুরুষদের। এটাও বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়ে ভাবতে হবে। এই প্রাচীন প্রতিভাটা কি এটা জানার একটা ইচ্ছা ছিলো।

এখন যত সহজে সাহসের সঙ্গে কথাটা বলতে পারছি ১০ বছর আগে হয়তো এতো সহজে বলতে পারতাম না। কারণ ১০ বছর আমি কাজ করছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, কৃষকের সঙ্গে কথা বলেছি এখন আমি পূর্বপুরুষদের প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত।

শা. চৌ : তার মানে আপনি ঐতিহ্যের সন্ধানে যাননি। ঐতিহ্যের মধ্য থেকে বিজ্ঞানে আসতে চেয়েছেন।

ফ. ম : একদম ঠিক বলেছেন। খুব সুন্দর বলেছেন। বিজ্ঞান তো এমন নয় যে এটা পশ্চিমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে কিছু আছে। আমাদের জীবনেই আছে।

শা. চৌ : একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র এলাকা খাওয়াচ্ছে। এটা বিস্ময়কর একটা ব্যাপার...

ফ. ম : আমি এখানে একটু বলি শাহাদত ভাই, আমার ধারণা আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন। জেনারেশন আকারে যদি বলি ’৭১-এর যুদ্ধ আমাদের পথ দেখিয়েছে। আমি যা কিছু এখন বলছি তার পেছনে কিন্তু রয়েছে যুদ্ধ একটা... ঘটনা

শা. চৌ : একটা বিজয়।

ফ. ম : হ্যাঁ একটা বিজয়! এই বিজয়টাই একসঙ্গে প্রশ্ন করতে সাহস যোগাচ্ছে, আমাকে মানুষের কথা ভাবতে সাহায্য করছে। আবার প্রথাগত অর্থে বামপন্থীরা যেভাবে মানুষ বোঝে ব্যাপারটা তাও নয়। সত্যিকার অর্থে আমাকে বুঝতে হচ্ছে মানুষগুলোকে কি নিয়ে এগুতে হবে। আমরা একটা রাষ্ট্র গঠন করেছি, দেশ পেয়েছি, জনগোষ্ঠী আছে, আবার আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা কি হবো আগামী ২০-৫০ বছরে? স্বাধীন জাতির একটি চালচিত্র আঁকতে হবে।

শা. চৌ : জাতিত্বও শুধু বিজয়ে নয়। এতো মানুষ ’৭১ একত্রিত হলো, সংযোগ হলো তার ফল তো আসতে হবে।

ফ. ম : একটা বিশাল ঘটনা। এটা নানানভাবে আমাদের মাঝে আছে। এই ব্যাপারে আমরা খুব একটা সচেতন না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেছে। এটা রক্তের মধ্যে

আছে। ব্যাখ্যা করে বোঝানো মুশকিল। আমি বড় হয়েছি মোটামুটি গ্রামীণ অর্থে একটা ধনী পরিবারে। আমাদের বাড়িতে আমরা শিখেছি আমরা জমিদারের সন্তান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে এবং চলাফেরা আমাদের ঐ রকম ছিলো। '৭১ তছনছ করে দিয়েছে সব। '৭১-এর ফলে যে অনুভূতি জাগলো তাতে আমি দু'দিকই দেখতে পাচ্ছি জগতের। নিজে শিখছি, নিজের ভুলগুলো ধরতে পারছি। নিজে লজ্জা পাচ্ছি, শুধরাচ্ছি এবং ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছি। এটার একটা মানসিক প্রভাব ছিলো, থাকবেই। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি প্রসঙ্গ তুলবো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শা. চৌ : আমি একটু বলে নিই। ফরহাদ মজহার কিন্তু কবি। আমার কাছে ও কবি বলেই পরিচিত ছিলো। ফরহাদ যে কথাটি সততার সঙ্গে বলছে তার প্রমাণ হলো '৭১-এর পর মাঝে একটি পরিবর্তন ও বহুমুখিতা দেখলাম। ভিন্ন মাত্রায় দেখলাম। নতুন চেহারাটা দেখলাম হঠাৎ!

ফ. ম : আপনার মনেও থাকে কথা! বিজ্ঞান সম্পর্কে যেটা বলছিলাম গ্রাম সম্পর্কে আমার জানা বোঝায় একটা শকিং ছিলো। একটা ছোট উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। আমি ধরে নিয়েছিলাম বীজ সম্পর্কে খুব ভালো জানি। ফার্মাসিস্ট ছিলাম। বইপত্র পড়েছি। গ্রামের এক মেয়েকে একটা বীজ দিয়ে বললাম এটা কেমন বীজ? মেয়েটা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে, বীজটা দাঁতের নিচে দিয়ে খুট করে একটা আওয়াজ করে বললো হবে ভাইয়া, এটা দিয়ে হবে। এখানে যুদ্ধের কথাটা আমি লিঙ্ক করতে চাচ্ছি। আজ যদি যুদ্ধটা না হতো শাহাদত ভাই তবে একটা কুসংস্কারের বশে মেয়েটাকে উপেক্ষা করে চলে যেতাম। এটা খুব খেয়াল করতে হবে। এই প্রথম কিন্তু আমি ভাবলাম দেখি তো মেয়েটা সত্য কথা বললো কি না? ঠিকই কিন্তু ঐ বীজ থেকে এক বছর পর ৯০ শতাংশ অঙ্কুরোদগম হলো।

শা. চৌ : এটাকে আমরা কি বলবো? ট্রাডিশন না বিজ্ঞানের কনটিনিউটি?

ফ. ম : ট্রাডিশন একদমই না। এটা হলো এডভান্স সায়েন্স। দেখেন যে মেয়েটি এটা বলতে পারলো সে নিশ্চিত ঐ বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটবে। কারণ মেয়েটি বুঝতে পারছে এই বীজটি ভাদ্র মাসে শুকানো হয়েছে ঠিক মতো। এই বীজটির হিউমিডিটি (আর্দ্রতা) কনটেন্ট সে দাঁতের চাপ দিয়ে বুঝতে পারলো। অর্থাৎ ফর্মাল বিজ্ঞান যে কাজটি করে ল্যাবরেটরিতে সেই কাজটি নিজস্ব অভিজ্ঞতায় মেয়েটি তার দাঁতের তলায় করলো। এটা এডভান্স টেকনোলজি ধরবো। এ কারণে ল্যাবরেটরিতে করার জন্য বিশাল যে স্টাবলিস্টমেন্ট লাগবে, তা লাগছে না। অথচ এটা ইক্যুয়ালি ভেলিড নলেজ। যখন এটা নিয়ে আমি আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করা শুরু করলাম তখন তারা বললো যে দু'ধরনের জ্ঞান আছে। এটা হলো ইনফরমাল। তখন আমি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিতর্ক করলাম। আমি বিশ্বাস করি বিজ্ঞান দুটো হতে পারে না, বিজ্ঞান একটাই। দুটো বিজ্ঞান কি করে থাকে? বিজ্ঞান যদি হয় তা তো একটাই হতে হবে। তখন তারা বললো, না কৃষকদের বিজ্ঞান আর ল্যাবরেটরির বিজ্ঞান তো এক হতে পারে না। তখন আমি টমাস কুহ্নের বিখ্যাত বই 'স্ট্রাকচারাল অব সায়েন্টিফিক রেভ্যুলেশনের' ভিত্তিতে বিতর্ক করলাম। বইতে তিনি বলছেন, যে বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে যে জ্ঞান উৎপাদন করে এটা মোটেও ফর্মাল নয়। সেখানেও অ্যাকসিডেন্ট, কল্পনা, ইনসাইড ইমাজিনেশন আছে। আবিষ্কার মানে তত্ত্ব বা তথ্যটা আছেই তা বের করা। বিজ্ঞানী কি করে আবিষ্কার করে আর কি করে লেখে দুটো ভিন্ন জিনিস। যে পদ্ধতিতে আবিষ্কারের কথা লেখে সেটা সত্যি পুরোপুরি নাও হতে পারে। লেখাটা কিন্তু মিথ্যা হলেও হতে পারে। সে বাস্তব থেকে, কল্পনা থেকে কিছু পায় সহযোগীদের চর্চায়, অন্যের অর্ধসমাপ্ত কাজ থেকে দেখেশুনে শিখে কাজটা করে। ফর্মাল বিজ্ঞানের মধ্যে ইনফর্মাল কনটেন্ট যেমন আছে, ইনফরমাল বিজ্ঞানে ফর্মাল কনটেন্টও আছে। কৃষক তো প্রতিদিনই চাষাবাদ করছে ক্ষেতে গিয়ে, ও তো ফর্মাল প্রসিডিওরেই করছে। আমাদের কৃষক মৌখিকভাবে এটা বলে।

শা. চৌ : জ্ঞানের ফর্মাল রূপদানকে আবিষ্কার বলে।

ফ. ম : নিঃসন্দেহে। যা হোক তখন আমরা বললাম বিজ্ঞানী যা লেখে সেটা হলো প্রসিডিউরাল স্টেটমেন্ট। আমি ওটাকে বিজ্ঞান বললাম না। আমার কৃষক যেহেতু ওরাল কালচারের লোক সে জানে এটা, সেসব জায়গায় মুখের কথায় বলে যায়। বলে যায়, পরিবারকে সন্তানকে শিখিয়ে যায়। কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে না ফর্মালি বলতে। বলতে বললে কিন্তু বলে। আমি যখন কৃষক নিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম, কৃষক যা বলে সেটাই আমি ফর্মালি সাজিয়ে লিখতে পারছি। এই কৃষকের কথা সাজিয়ে যখন আন্তর্জাতিক জার্নালে দিচ্ছি তখন এটা হয়ে যাচ্ছে ফর্মাল সায়েন্স। তখন আমার মাথায় এলো বাংলাদেশের কৃষিতে যদি আমরা বড় বিপ্লব করতে চাই, তাহলে তথাকথিত ফর্মাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমাদের লাগছে না। কেন? কারণ প্রতিটি কৃষকের পরিবারই ল্যাবরেটরি। তাহলে আমার যে কাজটা করতে হবে তা হলো তার দৈনন্দিন যে জ্ঞান, তাকে কিভাবে ফর্মাল করবো তারই একটি ইনস্টিটিউশন দাঁড় করাতে হবে। আমার দায়িত্ব বিজ্ঞানের থিওরিটিক্যাল জগতে যে বিপ্লব ঘটে গেছে তার সঙ্গে এটাকে মিলিয়ে নেয়া। আমি ফর্মাল ও কৃষক উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লব দেখছি। আমরা দুটোকে যদি মেলাতে পারি তবে বাংলাদেশের কৃষিতে বিরাট বিপ্লব ঘটবে। কারণ কৃষক তখন নিজেই বুঝতে পারবে তার কি করা উচিত। তখনই আমাদের নয়া কৃষি ব্যাপারটা মাথায় এসেছে।

শা. চৌ : এখানে বুঝতে হবে নয়া কৃষির দুটো ভাগ আছে একটা সাংগঠনিক, অন্যটি বৈজ্ঞানিক। নয়া কৃষি আপনি যেটা শুরু করলেন এটাকে কি আমি পাইলট প্রজেক্ট বলবো?

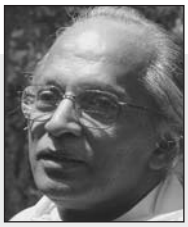

'১৫০০ জাতের ধান নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছি এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। এখন এর মধ্যে কোনটা কৃষক রাখবে কোনটা ফেলে দেবে সেটা কৃষকের ব্যাপার। তারপর লাইভস্টকে একটা বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে কৃষকরাই। নতুন ব্রিড করছে। নতুন জাত নিয়ে আসছে'

ফ. ম : আমি শুরু করি তাঁত দিয়ে। তখন উবিনীগ গড়ে উঠছে। উবিনীগের বিভিন্ন কাজের মধ্যে তাঁত একটা। তাঁতের কারণটা ছিলো তখন বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আমাদের একটা তর্ক চলছিল। তর্কের কারণ হলো বিশ্বব্যাংক তখন রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রমোট করছে। আমরা বলছি বিশ্বব্যাংকের রপ্তানিমুখী শিল্পের ধারণা দিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় পুঁজির উন্নয়ন হবে না। এনজিওগুলো তখন ইনকাম জেনারেশন, টার্গেট গ্রুপ উন্নয়ন নিয়ে কথাবার্তা বলছে। আমরা বলছি, বিশ্বব্যাংক ও এনজিওগুলো উভয়েই ভুল করছে। তথাকথিত টার্গেট করে কখনো বাংলাদেশের গরিবদের উন্নয়ন হবে না। আপনাকে অবশ্যই সেক্টর ধরে উন্নতি করতে হবে। আপনি এক একজন লোককে ধরে ধরে টাকা দেবেন আর ইনকাম জেনারেট করবে তা হবে না। আপনাকে সব সেক্টরে যেতে হবে। বিশ্বব্যাংক যে ভুল এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা গবেষণা শুরু করি তাঁত নিয়ে।

শা. চৌ : এটা কি অর্থনীতি? তাঁতের একটি টেকনোলজি ছিল না?

ফ. ম : রাজনৈতিক অর্থনীতি। টেকনোলজি ছিল কিন্তু তা নির্দিষ্ট নয়। তখন আমরা বলছিলাম হাউস হোল্ড বেইজ যে তাঁতগুলো চলছে তাকে আট দশ বছর ধরে উন্নয়ন করতে হবে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে থেকে এন্টারপ্রেনার জোগাড় করতে হবে। বিশ্বব্যাংক যে ছোট পকেট করে রপ্তানি করার কথা বলে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটা তারা কখনো করতে পারবে না। এ ছিল আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমি মনে করি, সে সময় খুব সঠিকভাবে প্রমাণ করতে পেরেছিলাম, আমরাই সঠিক।

গবেষণার জন্য গ্রামে গিয়েছিলাম তাঁতিদের কাছে। কাজ করতে গিয়ে দেখি এটা তো খুব মজার জিনিস। অনেক কিছু করা যাবে। দারিদ্র্য একটি সমস্যা। এই সময় '৮৮-তে বন্যাকবলিত হলো টাঙ্গাইলের তাঁতিরা। '৮৮-র বন্যায় যখন তাঁতিদের সহায়তা করতে গেলাম, তখন কৃষকরা বললো, শুধু তাঁতিদের কেন? আমরাও তো এই গ্রামে থাকি, আমাদের সহায়তা করবেন না কেন? আমরা জানতে চাইলাম, কি সহায়তা? চাষীরা বললো, বীজ ও

'চাষীরা বললো, বীজ ও কীটনাশক কেনার টাকা দেন। আমি তো ইকোলজিক্যালি রোমান্টিক। বললাম, বিষের জন্য টাকা দেবো এটা কেমন কথা? তখন মনে হলো কৃষক তো তার বর্তমানে শেখা চিন্তার জায়গা থেকে কথাটা বলেছে'

কীটনাশক কেনার টাকা দেন। আমি তো ইকোলজিক্যালি রোমান্টিক। বললাম, বিষের জন্য টাকা দেবো এটা কেমন কথা? তখন মনে হলো কৃষক তো তার বর্তমানে শেখা চিন্তার জায়গা থেকে কথাটা বলেছে। আমি তো চাপিয়ে দিতে পারি না। কীটনাশক ছাড়া চাষাবাদ করা যায় আমি কাগজে-কলমে পড়েছি, কখনো দেখিনি। কারণ তখন তার বীজ, সার, কীটনাশক দরকার। স্বাভাবিক যেভাবে বলে সেভাবে বলছে। আসলে কৃষককে যে বলছি কীটনাশক ছাড়া চাষাবাদ করো, এটা তো আমরা বইয়ের ভাষায় বলছি। এটা মুখে বুঝালে তো চলবে না। আমাদের করে দেখাতে হবে এটা সম্ভব কি না? তখনই কৃষি করার কথা মনে এলো।

শা. চৌ : তার মানে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো?

ফ. ম : ইকোলজিকি করে দেখাতে না পারলে কৃষক আমার কথা শুনবে কোন দুঃখে! তখনই মাথার মধ্যে এলো, এটা করে দেখতে হবে। তখন আমি পাইলট প্রজেক্ট বা মডেল আকারে করিনি। এতো দিন পরে এসে মনে হয় এটা একটা ভালো কাজ করেছি। এ ব্যাপারটি যে খুব ভেবে করেছিলাম তাও নয়। তখন একটা জায়গা নিয়ে নিজের জমিতে করিনি। ভাবনা ছিলো যদি ইকোলজিক্যাল কৃষি সত্যিকার অর্থে কাজ করে, তবে কৃষকের জমিতে করতে হবে। কৃষক এটা করে বুঝবে, আসলে সে কাজটা করবে কি না?

শা. চৌ : তখনই কি সংগঠনের প্রশ্ন এসে গেলো?

ফ. ম : আমি তেমন কিছু করলে তো করতেই পারি। আমার টাকা আছে, একটা জমি কিনে ছোট করে বাগান করতে পারি। কিন্তু শখের বাগান করে তো লাভ নেই। তখনই সিদ্ধান্ত নেই উবিনীগ কোনো 'মডেল' করবে না। হয় কৃষক করবে, নয় কৃষক করবে না। তখনই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু। প্রথমে কয়েক বছর নানা রকম ব্যর্থতা। হবে কি না তাও জানি না। আফ্রিকা গিয়ে বন্ধুদের পেলাম, এমন কোনো বই নাই যা পড়ি নাই। পড়ে পড়ে দেখছি, পড়ছি আর ভুলগুলো শুধরাচ্ছি, নিজে শিখছি।

প্রথম বিশ্বাস হলো বন্যার পর পর যখন কৃষকরা এসে বললো, ৪৫ দিনের মধ্যে তারা একটা কম্পোজ (কলাগাছ+কচুরিপানা+গোবর+চণা সার) করতে শিখেছে। নানা রকম পদ্ধতি আমি তাদের শিখিয়েছিলাম। সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এতো কম সময়ে কম্পোজ করতে পারছেন এটা বিরাট ঘটনা। কম্পোজ করার পর জমিতে সেটা ব্যবহার শুরু করলো। দেখলো এতে কাজ হচ্ছে। তখন তারা দলবাঁধা শুরু করলো। এটার নাম দিলাম প্রাকৃতিক কৃষি। তখন কৃষকরা বললো, এটা নয়া কৃষি। কারণ এই সার তৈরির প্রসেস তো প্রথাগত নয়।

শা. চৌ : 'নয়া কৃষি' মানে নতুন কৃষি। আসলে তো তা নয়...

ফ. ম : নতুন কৃষি অবশ্যই। পূর্বপুরুষেরা তো এভাবে করেনি। প্রকৃতির নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য, তার যে প্রাণবৈচিত্র্য, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু চর্চা পুরনো হলেও তা তাদের মাথা থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল।। কারণ এর মধ্যে বহু কিছু ঢুকেছে। আমার জন্য শিক্ষণীয় হলো, কৃষকরা বললো মান্ধাতা আমলের কৃষি করছি না আমরা, তাই এটা নয়া কৃষি।

এখানে একটা মজার গল্প বলি। প্রথমে আমার পশ্চিমা শিক্ষা ছিল, এনজিও মার্কা চিন্তা ছিল। তো ভেবেছিলাম অডিও ভিজ্যুয়াল দিয়ে ট্রেনিং দিলে মনে হয় ভালো হবে। কিন্তু অডিও ভিজ্যুয়ালে কোনো লাভ হলো না। তখন মনের মধ্যে সন্দেহ এলো। এতো ট্রেনিং দেই তবু কিছু মনে রাখতে পারে না কারণ কি? তখন আমার ধারণা হলো ওরাল কালচারের কৃষক অডিও ভিজ্যুয়ালে ভালো শিখবে আর শিক্ষিত লোক বই পড়লে ভালো শিখবে, হয়তো এর মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে। তখন একটা গবেষণা করলাম কৃষক কিভাবে শেখে। আমার আবিষ্কার হলো কৃষকের ওপর অডিও ভিজ্যুয়াল ট্রেনিং কোনো কাজ করে না। প্রশ্ন হলো, কি ট্রেনিং কাজ করে? জমির পাশে বসে ওদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, তামাশা করলে... ওদের ভাষায় ওরা বোঝে। নয়া কৃষির এটা হলো দ্বিতীয় সাফল্য।

শা. চৌ : ওদের জীবন যাপনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে...

ফ. ম : ওদের মতো করে বলতে হবে। ওরাল কালচারের যে জগৎ তার মধ্যে থেকেই ওদের মোটিভেট করতে হবে। অডিও ভিজ্যুয়াল দেখে মনে করবে সে সিনেমা দেখছে। এর কোনো ভূমিকা নাই ওর জীবনে। কিন্তু মাঠের কোনায় বসে ওদের সঙ্গে গল্প করলে এটা দারুণ কার্যকর। এখানে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, আপনি টাঙ্গাইলে যে ভাষায় কথা বলছেন, কুষ্টিয়ায় সে ভাষায় কথা বললে কাজ হবে না। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভেদে কৃষকের যে অবস্থান, আপনার তার সঙ্গে মিশে যেতে হবে। কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোরের লোকজনকে তাড়াতাড়ি পিক করতে পারবেন। টাঙ্গাইলে কিন্তু তা হবে না।

শা. চৌ : আমি আপনার ওখানে গেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হলো, মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে আপনি এক ধরনের রেজিমেন্টেশন পদ্ধতিতে যাচ্ছেন কি না? যেমন সকাল-সন্ধ্যায় গান গাওয়া- এটাকে আপনি কিভাবে বর্ণনা করবেন?

ফ. ম : আধুনিক সমাজের যে রেজিমেন্টেশন- আমি সে শিক্ষায় যাইনি। আমি মনে করি এসব শিক্ষাই কলোনাইজ। আমি এটা করতে চাই না। আমরা কেন্দ্রে কিন্তু প্রশিক্ষণ শব্দটা ব্যবহার করি না। বলি জানাজানি প্রোগ্রাম। কেন বলি? জানাজানি মানে ডায়ালগ। আমাদের গানও ডায়ালগের অংশ। কেমন গান হচ্ছে সাধক ধারার গান। যা গ্রাম বাংলায় দীর্ঘ সময় ধরে চর্চা হচ্ছে। এগুলো আমি সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ওরা যখন বসতে দিচ্ছে, তখনই ডায়ালগ হচ্ছে। দেখুন, প্রথমে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হলো। পরে চিন্তা এলো গ্রামে থাকা যুবকটিকে বের করতে হবে। যে গ্রামীণ জীবনকে মনে-প্রাণে ধারণ করে।

শা. চৌ : ফরহাদ, আপনি গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কথাও

ফরিদা আখতার নয়া কৃষি আন্দোলনে সহযাত্রী

বলছেন। সন্ধ্যায় গানের কথা যেটি বললেন, তো ব্যাপারটিকে কি আমরা এসকেপিজম বলবো? সারা দিনের কাজের শেষে...

ফ. ম : না না। শাহাদত ভাই, আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু আধ্যাত্মিক নয়, বস্তুবাদী। গ্রামীণ বা কৃষকের জীবনটাই এরকম। গ্রামের মানুষ কিন্তু জীবনকে আলাদা করে দেখে না। যেমন ধরেন, গ্রামের একটি মেয়ে নিজের খাওয়ার প্লেট থেকে দুমুঠো ভাত নিয়ে মুরগিকেও দিচ্ছে। সে ভাত ছিটিয়ে মুরগিকে ডাকছে। মুরগি এসে খাবারটা খাচ্ছে। এই মুরগির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক আধ্যাত্মিক বললে বলতে পারেন। একই সঙ্গে বস্তুবাদীও বটে। আমরা বলি, মরমী সাধকরা মূলত বস্তুবাদী। ওর জগৎটাই এমন। গানে ও বস্তুবাদের কথাই বলে। আমি চিন্তা ও চেতনায় পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত। এখানে মানুষ চিন্তা করে গান করে, আবার কৃষি কাজও করে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, ধর্ম ও জীবন একই ধারায় চলে। দু'ক্ষেত্রেই একই রিজন কাজ করছে।

শা. চৌ : আমার প্রশ্ন হলো, গানটা রেজিমেন্টেড কি না?

ফ. ম : সংগঠনের দিকে যদি তাকান, দেখবেন কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করে। করপোরেশনের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনেক রেজিমেন্টেড। ওখানে ছোট-বড় নেতা-নেতৃত্বের ব্যাপার। আমরা চিন্তা করেছি ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট পদ্ধতি অনুসরণ করবো না। অনুসরণ না করেও কৃষকদের সঙ্গে নতুন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন বা নতুন ধরনের সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব, সেটা আমরা দেখাতে পারবো। যদি এটা করে দেখাতে চাই তবে আমাদের ভেদাভেদহীন পথ খুঁজে বের করতে হবে। তখন গানটা, সকাল-সন্ধ্যায় গান গাওয়াটা প্রচন্ডভাবে আমাদের সাহায্য করে। সহায়তা করে, কিভাবে? সারা দিন কাজ শেষে ফিরে পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে দৈন্যগান করলো। ফলে কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগও থাকে, ওই ফাঁকে সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন দিনের বেলায় একটা অপরাধ করেছে, ঐ আসরে সে বলে ফেলছে, আর ভয় পাচ্ছে না। অর্থাৎ ওই গানের আসরে কর্মীরা কিছু হাসি-তামাশা, ঠাট্টার মাঝে তাদের অন্যায়-অপরাধ-আনন্দ ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। ফলে কর্মীদের মধ্যে একটি আত্মিক পরিবার গড়ে উঠছে। কর্মীরাও বোঝে যে এটা জেনুইন। ফলে আমরা মোমবাতি জ্বালাই। যা কিছু প্রয়োজন মনের জন্য সুন্দরের সব কিছু করি। বাইরের লোক দেখলে এটাকে স্পিরিচুয়াল মনে করবে। নিঃসন্দেহে এক অর্থে স্পিরিচ্যুয়াল...

শা. চৌ : আপনি সূত্রপাত করেছেন বিজ্ঞান দিয়ে। আমার জানার বিষয় হচ্ছে, বিজ্ঞানের সঙ্গে স্পিরিচ্যুয়ালের সম্পর্ক করছেন কিভাবে? আপনার বিজ্ঞানে...

ফ. ম : আমি তো 'স্পিরিট' শব্দটিকে ইনভারটেড কমার মধ্যে নিয়ে আসছি। স্পিরিচ্যুয়াল বলে কাজটি করছি না। আমি মনে করছি, আমাকে নতুন মানুষ তৈরি করতে হবে। সে এমন এক নতুন মানুষ, যে যৌথভাবে একই পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক অনুভব করবে। আমি যদি তাত্ত্বিকভাবে কম্যুনিস্টদের মতো বলি- দুনিয়ার মজদুর এক হও...

শা. চৌ : আমি কি এখানে বলতে পারি, স্পিরিচ্যুয়াল মানে মন। ওদের সমন্বিত মন?

ফ. ম : হ্যাঁ, খুব বলতে পারেন। বিভিন্ন মন নিয়ে এক মন তৈরির চেষ্টা করা, একত্রিত করা। তাদের মন ভাবনা একাগ্রতাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসা। পরস্পরের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত, যুক্ত এই অনুভূতিটুকু তাদের দেয়া। পরস্পরের প্রতি তাদের যে দায় আছে এটা বুঝিয়ে দেয়া। এই অনুভূতিটুকু তার মধ্যে জাগ্রত করা- এটাকেই স্পিরিচ্যুয়াল বললে ঠিক আছে।

শা. চৌ : নয়া কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে একটা কথা আপনি বলছেন, নতুন মানুষ তৈরি করা। 'নতুন মানুষ' শব্দটির ব্যাখ্যা ব্যাপক ও বিস্তর। তো নতুন মানুষ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটা জানতে চাইছি।

ফ. ম : নতুন মানুষ মানে নিজেকেও তৈরি করা। আমি তো আর বাইরের লোক না। কারণ প্রথমেই আমি বলেছি শিক্ষাকে আমি ভয় করি। একজন মানুষকে যখন ভালো-মন্দ শেখাই, তখন আমার ভালো-মন্দ থেকে শেখাচ্ছি। আমাকেও তো ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যে বদলে যেতে হচ্ছে।

শা. চৌ : তাহলে কি গোল বা লক্ষ্য আমাদের নির্ধারিত না?

ফ. ম : মানুষের বাইরে তো গোল আসবে না। দেখেন ১০ জন মিলে যখন পরস্পরের কাছ থেকে শিখছি, এক মুহূর্তে আমি হয়তো কর্তা, অন্য মুহূর্তে কর্তা নাও থাকতে পারি। আরেক মুহূর্তে অতি সাধারণ একজন কর্মী হয়তো আমাকে গাইড করছে।

শা. চৌ : আমি আসলে চূড়ান্ত পরিণতি বা আলটিমেট গোলের কথা বোঝাতে চাচ্ছি।

ফ. ম : আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি 'আনন্দ'। নয়া কৃষির লক্ষ্য কি? আনন্দ। বিনোদন নয়, আনন্দ। আনন্দ মানে যে এ কাজটা করবে তাকে উপলব্ধি করতে হবে,

এক নজরে

উবিনীগ : উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা।
প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৪ সাল
লক্ষ্য : জনগণ যা বলতে চায়, সে কথাটি গবেষণার মাধ্যমে নীতি নির্ধারনী মহলে পৌঁছে দেয়া।
উদ্দেশ্য : খেটে খাওয়া এবং সাধারণ মানুষের জন্য একটি সমাজ গড়ে তোলা।
শস্যাগার : নয়া কৃষির বীজ সম্পদ কেন্দ্র।
নবপ্রাণ : বাংলার সাধকদের ভাবান্দোলকে উৎসাহিত করে।
নয়াকৃষি : রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক এবং কৃষির বাইরের উপাদান ছাড়া যে কৃষি।
জানাজানি : প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান।
ফরিদা আখতার : নির্বাহী পরিচালক, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।

সংগঠনের সবার সঙ্গে তার একটা আনন্দের সম্পর্ক থাকতে হবে। আনন্দ কথাটির আরেকটি মানে হলো ব্যাপারটা শুধু মানুষে মানুষের নয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগে একটা আনন্দ বোধের ব্যাপার আছে। অর্থাৎ সে কৃষিকাজ করে, গাছটা লাগায়- এই কাজটা তাকে তো উপভোগ করতে হবে, আনন্দ করতে হবে। নয়া কৃষি করতে গিয়ে নিজেরা নিজেদের আবিষ্কার করেছি। কিছুটা বাংলার ভাব জগৎ থেকে গ্রহণ করেছি।

'আমার আবিষ্কার হলো কৃষকের ওপর অডিও ভিজ্যুয়াল ট্রেনিং কোনো কাজ করে না। প্রশ্ন হলো, কি ট্রেনিং কাজ করে? জমির পাশে বসে ওদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, তামাশা করলে... ওদের ভাষায় ওরা বোঝে। নয়া কৃষির এটা হলো দ্বিতীয় সাফল্য'

শা. চৌ : চৈতন্যবাদী...

ফ. ম : চৈতন্য থেকে নিশ্চয়ই এসেছে। বাউলরা এটাকে ব্যবহার করতো আস্বাদন হিসেবে। আস্বাদনকে আমাদের ভাষায় আনন্দ বলছি। আমি বলি, আপনার জীবনকে ভোগ করতে হবে। ভোগ আবার কনজ্যুমার অর্থে নয়। অর্থাৎ আপনি যে বেঁচে আছেন তার স্বাদকে আপনার অনুভব করা চাই। এখন স্বাদ যে পাচ্ছি সেটা আমার কর্মীদের মুখ দেখলেই বোঝা যাবে। বাইরের লোকও বুঝতে পারবে। নয়া কৃষি যদি ব্যর্থ হয় তবে বাইরের লোক বুঝবে এটা একটা বোগাস, প্রোপাগান্ডা। নয়া কৃষি পরিবারে বেড়াতে গিয়ে যদি দেখেন খাবার টেবিলে কয়েক পদের তরকারি আছে, তবে বুঝবেন সে আনন্দেই আছে। অর্থাৎ ইন্ডিকেশন তো খুব সহজ। যে কথাটি আমি সব সময় বলতে চেষ্টা করি, আমরা অতীতবাদী নই। ঐতিহ্যবাদী নই একদমই। যা কিছু বিশ্বে চলমান, যা আমার মনের মধ্যে সাড়া জাগায় তাই এডাপ্ট করি। দেখবেন, আমি যখন দৈন্যগান করি তখন বলি কর্মীরা যা খুশি গাইতে পারবে। সন্ধ্যাবেলায় ওরা যদি হিন্দি গান গায় কি আপত্তি আছে তাতে। ওটা অপসংস্কৃতি এসব কিছু নয়, এমন ভাবি না। অর্থাৎ তার স্বাভাবিক যে ইচ্ছা সেটাকে কোনোভাবেই দমন করা যাবে না। তার সঙ্গে ডায়ালগ হতে পারে কিন্তু দমন করতে পারবেন না। এই প্র্যাকটিসটা আমরা নীতিগতভাবে মেনে চলার চেষ্টা করি। কেন্দ্রে গেলে আমি আর আমার স্ত্রী ফরিদা একসঙ্গে থাকি না। আমি ছেলেদের সঙ্গে আর ও মেয়েদের সঙ্গে থাকে। ছেলেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা শেয়ার করি। ওরা যেন নিজেকে আমার সামনে খুলে ধরতে পারে তার জন্য বাবা, বন্ধুর মতো ব্যবহার করি। আমি এ নিয়ে কাউকে বলি না। ফরিদা কখনো মেয়েদের কথা আমাকেও বলে না।

শা. চৌ : কাজটা ক্ষুদ্র আকারে শুরু হয়েছিলো। আস্তে আস্তে এর ব্যাপকতা বাড়ছে। প্রশ্ন হলো, আপনি কতদূর যাবেন বা যেতে পারবেন?

ফ. ম : এই প্রশ্নটা আমাদেরও আছে। একটা জিনিস বলি, যখন নয়া কৃষি শুরু করি তখন ধারণা ছিলো ইকোলজিক্যাল কৃষি আমার জীবদ্দশায় হবে না। সত্যি কথা বলছি! কারণ এটা কঠিন, এটা কখনও হবে না- এরকমই ধারণা ছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ২০০-৩০০ লোক নিয়ে করা হয়তো সম্ভব ছিলো। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরে ২ লাখ পরিবার নিয়ে করতে পারবো এটা আমার চিন্তায় ছিলো না। এখন ১২টি কেন্দ্র যে সারা বাংলাদেশে আছে, এটা অবিশ্বাস্য লাগে।

শা. চৌ : আমি যদি ১২টি বার খাড়া করি, এগুবার মাত্রা নির্ধারণের জন্য এবং অঙ্ক করি তবে পুরো বাংলাদেশ নয়া কৃষির প্রভাবে...

ফ. ম : আমি বলি, সরকার যদি কনভেনশনাল কৃষিকে সুযোগ না দেয়, সাবসিডিয়ারি দিচ্ছে এটা যদি বন্ধ করে দেয়, তাহলে ১০ বছরের মধ্যে নয়া কৃষি হয়ে যাবে বাংলাদেশের পুরোটাই। এখন কনভেনশনাল কৃষি টিকে থাকছে, কারণ শুধু সরকারি ভর্তুকিতে।

শা. চৌ : বিশ্বব্যাংক এর পক্ষে আছে... একই কথা বলছে!

ফ. ম : বিশ্বব্যাংক সব কথা খারাপ বলে কথাটা ঠিক না। আপনি পানি, বিদ্যুৎসহ সব কিছুতে ভর্তুকি দিয়ে একটা ভঙ্গুর (আনসাসটেইনেবল) কৃষি করছেন যেটা অর্থনীতিতে কোনো অবদান রাখতে পারছে না। যদি একই প্রিভিলেজ দেন তবে এমনিতেই নয়া কৃষি অনেক বেশি উৎপাদনমুখী এবং অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখতে পারবে।

মাত্র ৫-৭ বছরে ১৫০০ জাতের ধান নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছি এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। এখন এর মধ্যে কোনটা কৃষক রাখবে কোনটা ফেলে দেবে সেটা কৃষকের ব্যাপার। তারপর লাইভস্টকে একটা বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে কৃষকরাই। নতুন ব্রিড করছে। নতুন জাত নিয়ে আসছে। আর এক ধারা মাছের দিকে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আমরা এখন বিশাল মাছের প্রজেক্ট করছি। বিশাল করে হর্টি কালচারের দিকে যাচ্ছি। এই ব্যাপারগুলোতে এখন আমরা দারুণ আত্মবিশ্বাসী। এমনকি নয়া কৃষির তথাকথিত উন্নয়নে পয়সার দরকার নেই। যখন আমরা ঢাকায় এই কৃষি পণ্য বিক্রির জন্য প্রথম দোকান খুলি, তখন ভাবতাম কত আর বিক্রি হবে! এখন ঘটনা হলো আমরা পণ্য সরবরাহ করে কুলাতে পারছি না।

শা. চৌ : আপনার কথায় প্রাচীনতার ব্যাপারটি আসছে। অর্থাৎ ঘানির কথা বলছেন। এখন আমরা যদি মানুষকেন্দ্রিক শ্রম শিল্পে চলে যাই তখন তো কাজের লোকের ঘাটতি হবে।

ফ. ম : এই চিন্তা আমাদেরও আছে। আপনি খুব সঠিক জায়গা চিহ্নিত করেছেন। শুরুর দিকে বড় ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করার দরকার ছিল না। ইউনিয়নভিত্তিক কাজ করতে গিয়ে দেখি শ্রমিক নেই। শ্রমিক গেছে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে। অথবা ঢাকা শহরে পড়ে আছে। কুড়িগ্রামের চরে কাজ করতে গিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো চরের সমস্ত লোক চরের বাইরে কাজ করে। পানি যখন থাকে না তখন চরে কোনো লোক থাকে না। মজাটা হলো যখনই আপনি কাজটা করছেন তখনই চরের লোকটা ফেরত যাচ্ছে। এখন আমরা চিন্তা করতে পারছি, যদি বাংলাদেশের উন্নয়নের ছবি আঁকি আগামী ১০ বছরের, তাহলে ছবিটা কেমন হবে, দেখতে কেমন? চিন্তা করলেই আপনাকে নতুন নগরায়ণের কথা ভাবতে হচ্ছে। এতদিন আপনি শহরকেন্দ্রিক নগরায়ণ দেখেছেন। তখন গ্রামগুলো কিন্তু শহর হবে। মানে ছোট টাউনশিপ এখানেই গড়ে উঠবে। গ্রামে টিনের ঘরের জায়গায় দেয়াল উঠবে, সিনেমা হল হবে। আমরা গ্রামে কম্প্যুটার নিয়ে আসবো। কিন্তু প্রিন্সিপল ছাড়ছি না। অর্থাৎ আমার পরিবেশটা থাকবে উপভোগ্য। ফলে গ্রামীণ স্থাপত্যেও বিপ্লব ঘটে যাবে! আগামী ৫ বছরের মধ্যে ঈশ্বরদীতে যে ঘর বানাবো সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের হবে। অর্থাৎ আমাদের ধারণা, চিন্তা ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে তরুণ ছেলেমেয়েরা নতুন নগরায়ণে উৎসাহী হয়ে এটাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাবে। আমি যদি খাবার তৈরি করতে পারি, কাপড় বানাতে পারি, বেসিক প্রয়োজন মেটাতে পারি, রপ্তানির মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি কেনার মতো অর্থ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারি, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও আবিষ্কার সম্পর্কে তাদের উৎসাহ উসকে দিতে পারি, তবে গ্রামই নয়া শহর হয়ে উঠবে। নয়া কৃষি এটা পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

শা. চৌ : ফরহাদ, যেটা বলছেন তা হলো, নগরের সুবিধাকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। নগরায়ণের ধারণাকে বদলে দিতে

হবে। বিদেশে যেটাকে 'কাউন্টি' বলে?

ফ. ম : হ্যাঁ। নামই দিতে হবে কৃষিনগর।

শা. চৌ : গ্রামীণ শক্তি কাঠামোর সঙ্গে কিভাবে বসবাস করছেন?

ফ. ম : আমরা যারাই গ্রামে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে যাই, প্রথমদিকে গ্রাম্য টাউটরা তাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। দলে ভেড়াতে ব্যর্থ হলে শত্রুতার অবস্থানে চলে যায়। কিন্তু প্রথম থেকেই আমাদের কৌশল ছিলো যেন গ্রামে আমাদের কাজ করতে অসুবিধা না হয়, বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছাতে অসুবিধা না হয়। নয়া কৃষির সদস্য অনেক, কিন্তু আমরা এগ্রেসিভ নই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা শক্ত অবস্থান নিয়েছি। সাধারণভাবে উন্নয়নমূলক কাজ যারা করে এমনকি বামপন্থীরাও গ্রামীণ শ্রেণীর মেরুকরণ করতে গেছে, ধনী কৃষক বনাম ভূমিহীন কৃষক এই মেরুকরণকে সঠিক রাজনীতি বলে মনে করি না। যার ৯-১০ একর জমি আছে, সে আসলে আহামরি ধনী নয় গ্রামে। অনেক ক্ষেত্রে এখন তারা নয়া কৃষির শক্তিশালী প্রবক্তা। কারণ সেও লাভবান হচ্ছে। ফলে রাজনৈতিকভাবে গ্রামে আমরা শ্রেণী মেরুকরণের পক্ষপাতি নই।

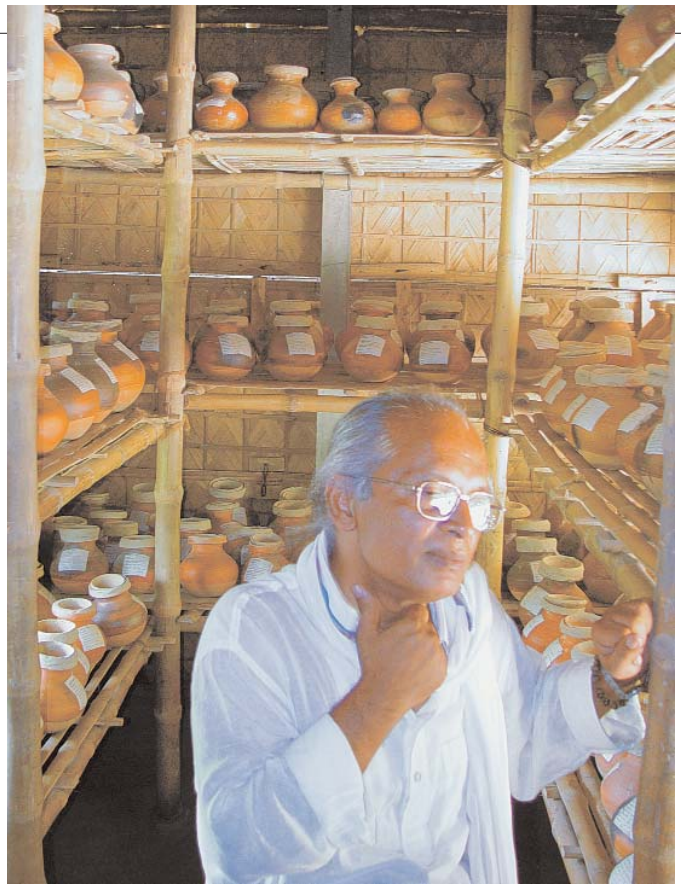

বীজাগারের মাঝে ফরহাদ মজহার

শা. চৌ : গ্রামে একটা মেরুকরণ আছে। একটি এলিট শ্রেণী, অন্যটি ভূমিহীন। তো এটাকে চিহ্নিত করছেন কিভাবে? ভূমিহীনকে কিভাবে নিচ্ছেন? ভূমিহীন মানে তো শ্রমিক। আরেকটি হলো জমির মালিক। এখানে ভূমিহীনকে কিভাবে সম্পৃক্ত করছেন?

ফ. ম : ঠিকই বলেছেন নয়া কৃষি যখন গড়ে ওঠে, তখন ভূমিহীনের চেয়ে ছোট কৃষক বেশি ছিলো। ধীরে ধীরে আমাদের সঙ্গে ভূমিহীনরাও যুক্ত হয়েছে, যুক্ত করতে হয়েছে, তারাই তো কৃষক। সম্প্রতি ফরিদা আকতার একটা কাজ শুরু করেছেন, যেসব গ্রামে নয়া কৃষি আছে সেসব গ্রামের একেবারে সহায়-সম্বলহীন মানুষদের নিয়ে। প্রাথমিক গবেষণায় যেটা প্রমাণিত তা হল ১৭ থেকে ২৫ শতাংশ পরিবার কুড়িয়ে খেতে পারে নয়া কৃষি গ্রামে। শাক, লতা-পাতায় ওরা কিন্তু টিকে যায়। ওরা যদি হাঁস, মুরগি, কবুতর পালে তবে তা মরবে না, কারণ নয়া কৃষি গ্রামে বিষ নেই। সেখানে ছোট মাছ পাওয়া যায়। গরিব মানুষেরা এসব সুবিধা নয়া কৃষি গ্রামে পাচ্ছে। একটি স্টাডিতে দেখা গেছে, নয়া কৃষি গ্রামে ওদের পুষ্টি ও খাদ্য অন্যান্য গ্রামগুলোর চেয়ে ভালো। ফরিদা আকতার এই গ্রামের মেয়েদের ছাগল আর গরু জোগান দেয়া শুরু করলো। কৌশল হলো, কিছু নেই এমন মহিলা নয়া কৃষি গ্রামে গরুটা পালতে পারবে, ঘাসের অভাব নেই। আবার কৃষকের কোনো সমস্যা নেই, সে গোবর পেতে পারে। এটা অত্যন্ত সফল প্রোগ্রাম। গরুটা কিন্তু ঋণ নয়। গরুর ২টি বাচ্চা হবার পর সে একটার মালিক হয়ে যায় অন্যটি আরেকজন গরিব মানুষকে দিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে এই গরিব মহিলাই ছোটখাটো ইন্টারপ্রেনার হয়ে উঠছে। পরে ওদের আমরা হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ দেবো। যেহেতু একটা ভিত্তি হয়ে গেছে তাই ওদের নিয়ে ভাবতে পারছি। ভিটে বাড়ি ফলের গাছ লাগাচ্ছে। এই মুহূর্তে ফরিদা আকতার একটা ঢেঁকি গ্রামও বানাচ্ছে। দেখা যাক কি হয়। একটি পুরো গ্রামে ঢেঁকি দেবো, মহিলারা ঢেঁকিতে চাল বানাবে আমরা কিনে নেবো। কারণ, শহরে সাপ্লাই বেশি। তারপরও দেখবেন আমরা সাপ্লাই দিয়ে কুলাতে পারবো না। এখন এই গ্রামের গরিব মহিলাটি আগে যা আয় করতো তার চেয়ে অনেক বেশি আয় করতে পারবে। ঢেঁকি যে খুব ব্যাপক করা যাবে তা নয়!

শা. চৌ : আমার ধারণা, ঢেঁকি গরিব মানুষের জন্য ভালো হাতিয়ার।

ফ. ম : অবশ্যই। তাঁত থেকে উদাহরণ দিলে ভালো বুঝবেন। প্রথম দিকে যখন তাঁতের সহায়তা দিলাম, তারা কিন্তু বেশিদিন এ অবস্থার মধ্যে থাকে না। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলে। টেকনোলজিও বদলে ফেলে, উন্নয়ন ঘটায়। এখন আমরা ভাবছি শহরের মানুষ যদি স্পেশালি ঢেঁকির চাল খেতে চায় তবে তাকে অবশ্যই বেশি মূল্য দিতে হবে। মানে হলো এমন কিছু মহিলা থাকবে আগে যে রিটার্নটা পেতো না, তার চেয়ে অনেক বেশি রিটার্ন সে পাবে। কিছু ক্ষেত্রে আমরা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে যাবো। কিছু বিশেষ চাল ঢেঁকিতে করা হবে। এখনকার অনেক ধান ঢেঁকিতে ভাঙা যায় না। ঢেঁকির অনেক রকম

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করা যেতে পারে প্রয়োজনে। এখানে ঢেঁকি নিজেই ইন্টারপ্রেনিউর।

শা. চৌ : '৭২-এ ফেরত যাই। সে একটি থিসিস ছিল কৃষিতে ধনতন্ত্রের যে বিকাশ, নয়া কৃষিতে এটাও কি করছেন? কিভাবে ঘটাচ্ছেন?

ফ. ম : নয়া কৃষির মাধ্যমে যে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটবে সেটা ইতিবাচক হবে এমন দাবি করবো না। কৃষকের হাতে পুঁজি আসবে, আরো পুঁজি বিনিয়োগ হবে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটা একমাত্র ইতিবাচক হবে বৈপ্লবিক পদ্ধতির মাধ্যমে। রাজনীতির প্রশ্ন যেহেতু তুললেন, তাই একটা উদাহরণ দিই। নয়া কৃষির পজিশন হলো, ক্লাসিক্যাল বাম ধারারই সঠিক ধারা। ফলে জমির জাতীয়করণ ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্য সবচেয়ে ভালো পথ। আমি বলছি, জমির জাতীয়করণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নাও হতে পারে। যেমন আমাদের গ্যাসের মালিক জনগণ কিন্তু আইনত এটাকে আমরা রাষ্ট্রীয় মালিকানা করে ফেলেছি। আরো অনেক ফর্মে কিন্তু গ্যাস নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারতাম। যদি রাষ্ট্রে একটি বিপ্লবী বা গণতান্ত্রিক সরকার থাকতো তাহলে তারা বলতো জমি জনগণের। এবং জমি গ্রামে কৃষকদের সমবায়ের কাছে থাকবে। গ্রামে কোনো ল্যান্ডলর্ড থাকবে না। যে কৃষক চাষাবাদ করবে তাকে উৎখাত করা যাবে না।

শা. চৌ : এখানে কি কমিউন শব্দটি ব্যবহার করা যায়?

ফ. ম : কেন নয়? এটাই পুঁজি বিকাশের সবচেয়ে ভালো পথ।

শা. চৌ : আপনার কৃষি কি ঐ ধারণার মধ্যে গেছে?

ফ. ম : না যায়নি। যেহেতু সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে পড়েছে। কমিউনিজম সম্পর্কে নানা রকম নেতিবাচক ধারণা আছে। এই একটা সমস্যার সমাধান আমরা আমাদের সমাজে করতে পারিনি। কমিউনের কোন ফর্মটার কথা আমরা বলছি? বাংলাদেশের চরিত্রে ঐ ফর্ম তো নাও থাকতে পারে। নয়া কৃষি মনে করে এটা নিয়ে একটা জাতীয় তর্ক হওয়া উচিত। পুরনো ধারাটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় এখনও। এখানে একটা কথা বলতে চাই, লেনিনের রেভ্যুলেশনারি পথ সম্পর্কে আমাদের একটা সমালোচনা আছে। সমালোচনাটা হলো, লেনিন ধরে নিয়েছিলেন দল যদি ক্ষমতায় যায় তবে আইন করে জমি থেকে ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ করতে পারবে। আমার মনে হয় এখানে ভাববার বিষয় আছে। ঐতিহাসিক ধারণা থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙবার পেছনে, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার কারণে, পরবর্তীতে স্টালিনিজমের উত্থানে এটা হলো। এই বিষয়টা আমাদের মাথার মধ্যে আছে। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে দুটো ধারায় চিন্তা করার পদ্ধতি ক্ষমতা নিলেই বদলাতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে কম্যুনিজম ব্যর্থ হবার কারণ ছিল, কারণ দুটোকে সে আলাদা করে ভেবেছে। আমরা যদি রাজনীতি করি তাহলে উৎপাদন ও রাজনীতিকে হাত ধরাধরি করে চলতে হবে।

শাহাদত ভাই, আরেকটি বিষয় বলি আপনার ভলো লাগবে। বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করা বড় বড় সাধকদের দেখেছি তার প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপক্ষে। দার্শনিকভাবেই তাদের এই অবস্থান। কিন্তু তাদের কেউই আইন জারি করে শিষ্যদের বলেনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করতে। কেন? কারণ তারা মনে করেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে 'আমি' ব্যাপারটা জড়িত। কালচারাল প্রশ্নটি জড়িত। কালচারাল স্ট্রাগল করার ব্যাপার আছে এখানে। স্ট্রাগল না করে, ভেতরের 'আমি' রেখে আইন করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে উৎখাত করবেন আর সমাজতন্ত্র হয়ে যাবে এটা হয় না। আমি এটাকেই বলছি দার্শনিক ত্রুটি। আইন জারি করে রাজনৈতিকভাবে তারা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছে। আমাদের সাধকরাও তাদের গানে সাম্যবাদের কথাই বলছে। আমরা বলছি বিষয়টি সাংস্কৃতিক নৈতিকতার, আইনগত বিষয় নয় বা আইন করে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় না। আমি কেন গান করছি, কালচারাল কাজ করছি- তার উত্তরটা সম্ভবত পেয়ে গেছেন।

শা. চৌ : পাইলট প্রজেক্ট বা তপোবন বা গান্ধী আশ্রম স্টাইলে কতটুকু এগুনো যাবে?

ফ. ম : নয়া কৃষির কিছু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা আছে। বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব পড়বে। প্রথম প্রস্তাবনা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ মডেল। এটা প্রশ্নবোধক হয়ে গেছে। আগে আমরা প্রগতি ও আধুনিকতা বলতে বুঝতাম ডিস্ট্রারকশন এগ্রিকালচার। নয়া কৃষি বলছে এটা ঠিক না, তাই নতুন করে রিভিউ করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে এটা আমাদের ভবিষ্যৎ কি না। কৃষিতেই থাকবে মানুষ, প্রকৃতির সঙ্গে থাকবে মানুষ, আধুনিক মানুষ। অসুবিধা কি?

শা. চৌ : আমি '৭০-এর গোড়ার দিকে বলেছি, মানুষ ভাতই খাবে, তেল খাবে না।

ফ. ম : ভাত যেমন করে হোক উৎপাদন করতে হবে! তাহলে এক নম্বর প্রশ্ন হলো এটা কৃষির প্রশ্ন। দুই নম্বর নয়া কৃষি বলছে, রাজনীতি হলো জীবন যাপনের একটা ধারা। আমি কি খাই তার দ্বারাই আমার জীবনধারা বোঝা যাবে। লাইফ স্টাইলটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার জীবন যাপন, কেমন করে চলাফেরা করি, কি খাই, কি পরি ইত্যাদির সঙ্গে কি ধরনের সমাজ গড়ে তুলতে চাই তার একটা সম্পর্ক আছে। তিন নম্বর হলো, মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের মধ্যে কিছু বিচ্যুতি ঘটে গেছে। মূল কথা হলো, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে কিছু অবক্ষয় ঘটেছে। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, আপনার ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ঘ্রাণ দিয়ে এখন আর বুঝতে পারেন না কোনটা কোন ফুল। জিহ্বার স্বাদ কমে গেছে, স্পর্শানুভূতি কমে গেছে, খাওয়ার সময় বুঝবেন না বিষ খাচ্ছেন না সঠিক জিনিস খাচ্ছেন। নয়া কৃষি বলছে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের যে ক্ষতি হয়েছে সেটাকে ফেরত আনতে হবে। এটা ফেরত আনলেই একটা নতুন জগৎ ধরা পড়বে। যে জগৎটা আমরা অনেক বেশি উপভোগ করতে পারবো। এই কাজগুলো কমবেশি প্রচারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বলতে পেরেছি।

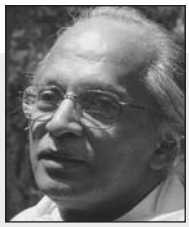

'মরমী সাধকরা মূলত বস্তুবাদী। ওর জগৎটাই এমন। গানে ও বস্তুবাদের কথাই বলে। আমি চিন্তা ও চেতনায় পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত। এখানে মানুষ চিন্তা করে গান করে, আবার কৃষি কাজও করে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, ধর্ম ও জীবন একই ধারায় চলে'

শা. চৌ : নয়া কৃষির রাজনীতি ও দর্শন কি দাঁড়ালো এখন?

ফ. ম : ব্লু প্রিন্ট হাতে নিয়ে কাজ করাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করি। ডায়ালগের সম্ভাবনা, কথা বলার সম্ভাবনাকে আমি মনে করি রেভ্যুলেশন। এই সম্ভাবনার দ্বার সব সময় আপনাকে খোলা রাখতেই হবে। আমার একটা দর্শন আছে। আমি কার্ল মার্কসের ছাত্র। লেনিনের সমালোচনা আমি মার্কসের জায়গায় দাঁড়িয়ে করেছি। মার্কস বলেছেন, বুর্জোয়া সমাজে রাজনীতি ও অর্থনীতির একটা বিভাজন ঘটে। বিভাজন ঘটে বলেই রাজনীতি একটি স্বাধীন জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করলেই অর্থনৈতিক সম্পর্কে প্রবর্তন ঘটানো সম্ভব। আমি মনে করি মার্কসের কতগুলো

মৌলিক বৈপ্লবিক অবদান আছে। এখন কোনো মানুষ যদি নতুন কোনো কাজ করতে যায় তাহলে মার্কসের সংস্পর্শ ছাড়া কোনো উপায় নেই। মানে হলো মার্কস থেকে আবার শুরু। এখান থেকে শুরু করার পর যে ভূমিতে এটা বিকশিত করিয়েছি সেটা হলো বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থান। অবস্থানটা হলো বাংলাদেশে জন্মেছি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা সমাজের মধ্যে মার্কসের চিন্তাকে চর্চা করতে হবে এবং সেই চর্চার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে। নতুন কিছু বলছি না কিন্তু। মার্কস ক্যাপিটালিজমের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচার কথাটা যোগ করতে চাই। মার্কস এই কথাটা পরিষ্কার করে বলেননি। ক্যাপিটালিজম শব্দটা ব্যবহার করেছেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক অর্থে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সম্পর্ক একই সঙ্গে ইকোলজিক্যাল সম্পর্কের অধীনে বিচার করতে হবে। মানে মার্কসের একটা ইকোলজিক্যাল সমালোচনা দরকার।

নয়া কৃষি হলো কৃষির জায়গায় দাঁড়িয়ে কৃষিরই ধারা। পাশাপাশি আমার কিছু রাজনৈতিক কাজও আছে। আমি মনে করি নয়া কৃষি কখনো সফল হবে না, যদি না একই সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাত না চলে। নয়া কৃষি একা এ কাজ করতে পারবে না। আমি কখনো বলি না সুযোগ এলে রাজনীতি করবো না, যে কারণে আমরা কোনো এনজিও করিনি। উবিনীগ প্রাঃ লিঃ কোম্পানি। সরকারকে ট্যাক্স দেই নিয়মিত। কাজেই একজন ব্যবসায়ী যেমন রাজনীতি করে, আমিও করতে পারবো। এখানে আমাদের কোনো ভনিতা নেই। আমি মনে করি রাজনৈতিক সম্ভাবনা যদি কখনো গড়ে ওঠে বাংলাদেশে, তাহলে দেখবেন সেখানে একটা ভূমিকা পালন করবো। চুপ করে বসে থাকবো না। আমরা মনে করি পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থার সঙ্গে যদি লড়াই থাকে তবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বিরোধ থাকবে। বাংলাদেশের বর্তমান যে উদার বাজারনীতি, এর সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকবেই। কৌশলগতভাবে নয়া কৃষি যদি আরো শক্তিশালী বা ভিত্তি আরো মজবুত না হয়, তবে দৃশ্যমান কোনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত হবে না।

শা. চৌ : শুরুতে আপনি বলেছেন, '৭১-এর পরিবর্তনের ফলে আমরা অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমি মনে করি আপনি কবি, আমার কাছে এক সময় কবিই ছিলেন, সেখান থেকে উৎপাদনের সঙ্গে রিলেট করলেন কিভাবে? '৭১-এর পর আমাদের যে ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হলো, চিন্তা-ভাবনা একই দিকে ধাবিত হলো। আমরা এলাম বিচিত্রা নিয়ে। এই সময়ে আপনারা একটা দল কয়েকটি বিস্ময়কর নাটক লিখলেন। আপনার প্রজাপতির লীলারাস্য, সাযযাদ কাদিরের সাড়ে সাতশ' সিংহ, সেলিম আলদীনের জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন ইত্যাদি। এই নাম থেকেই বোঝা যায় এগুলো গতানুগতিক ধারার নাটক নয়। এটা আপনারা সমন্বিতভাবে একসঙ্গে কিভাবে করলেন? এটাকে যদি '৭১-এর ফসল বলি...

ফ. ম : নাটক যে একটা শক্তিশালী মাধ্যম, এ উপলব্ধি ৭০ দশক থেকেই আমার মধ্যে ছিল। আমি, সাযযাদ, সেলিম শাহনুর আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ। সত্যি কথা বলতে, সেলিমকে প্রথম নাটক আমি লেখাই। সেলিম গল্প লিখতো, তখন তাকে নাটক লিখতে বলতাম। কারণ ওর গল্পের মধ্যে আমি নাটকের উপাদান খুঁজে পাই। আমরা একেকজন একেকদিকে গেলাম আর সেলিমের মাথার মধ্যে নাটক গেড়ে বসলো। এই নাটকে প্রথম সেলিম আলদীন, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, আল মনসুররা এলো। নাটকটা পরিচালনা করেছিলো মুজিব বিন হক। মজার ঘটনা হলো, এই নাটকটি প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে দেখানো হয়।

শা. চৌ : নাগরিকের আগে।

ফ. ম : হ্যাঁ, নাগরিকের আগে। সত্যি বলে না। নাগরিক প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে নাটক করেছিল এটা ভুল তথ্য। বহুবচন নাট্যগোষ্ঠী প্রজাপতির লীলারাস্য প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে নাটক। তারপর বহুবচন অনেকগুলো নাটক করে। আমরা সবাই তখন প্রায় এসেছি বাম রাজনীতি থেকে। '৭২, '৭৩ ও '৭৪-এর অরাজকতা বা একদলীয় ব্যাপারটা পুরোপুরি নিতে পারছিল না, এগুলো ছিলো তার প্রতিবাদ। বিচিত্রা নানাভাবে প্রতিবাদ করেছে বলে জনপ্রিয় হয়। যেমন এনায়েতুল্লাহ খানের ৬৫ মিলিয়ন কলাবোরেটর লেখা মানুষ লুফে নেয় প্রতিবাদ হিসেবে। নাটকের কথায় ফিরে আসি। আমি বিদেশ চলে যাই। বহুবচন এগুতে পারলো না। কিন্তু নাসির উদ্দিন বাচ্চু আর সেলিম আলদীনের যোগসূত্র এদেশে নাটকে বড় ঘটনা।

শা. চৌ : '৭১-এর পরবর্তী সময় আপনি ভাষাতত্ত্ব, গণিত ও যুক্তরাষ্ট্রের বাম আন্দোলন নিয়ে চর্চা করেছেন পল সুইজি, চমস্কির সংস্পর্শে আসেন এই সময়ের যদি একটু বর্ণনা দেন, এদের কেমিস্ট্রিটা আপনাকে বোঝার জন্য যদি বলেন?

ফ. ম : সেই সময় এরা তো ছিলোই। আরেকটা লোক আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিলো, তিনি হলেন ইকবাল আহমেদ। ইকবাল ভাই-ই প্রথম বোঝালো '৭১-এ আমরা যে এমএল ধারাটা ক্যারি করতাম তার ত্রুটিটা কোথায়? তখন আমরা খুব পড়ছি 'রেভ্যুলেশন ইন দ্য রেভ্যুলেশন'। তিনি আমাকে বোঝালেন বিপ্লব আমদানি করা যায় না। তখন মার্কসিস্টদের ক্লাস হতো, উইকলি রিভিউকে কেন্দ্র করে রেডিক্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিস্টদের গ্রুপ ছিলো, তখন খুব অ্যাকটিভ সময়, ইরানে বিপ্লব শুরু হয়েছে, ল্যাটিন বিপ্লবীরা তখন একত্রিত হয়েছে। তখন নিউইয়র্ক একটা তরতাজা জায়গা। এই সময়টা আমার জন্য সাংঘাতিক শিক্ষণীয়। আমার জগৎটা তখন বদলে যাচ্ছে। ঐ সময় পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব বামরা যেন জড়ো হয়েছে আমেরিকায়! সারা পৃথিবীতে ঐ সময়টা বাম জাগরণের। ৬০ দশকের শেষ এবং ৭০-এর তরুণ একটিভিস্টদের সঙ্গে বামদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আমি আপনাকে বলেছি গণিতের প্রতি আমার সাংঘাতিক টান ছিল। '৭১ আমাকে মানসিক প্রস্তুতি ও খোলামেলা হতে সাহায্য করেছে। আমার কাছে মনে হয়, আমি বেঁচে গেছি আমেরিকায় যেয়ে। আমি কিন্তু রেডিক্যাল রাজনীতিতে এসেছি গণিত পড়ে। এখানে যা পড়েছিলাম তা প্রায় অপাঠ্য ছিলো। আগে ধারণা ছিলো গণিত সত্য দেয়। এটা পড়ে বোঝা গেলো গণিত এক্সোমেটিক বিজ্ঞান মাত্র। এটা সত্য নিয়ে ডিল করে না। তখন প্রথম আমি বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলাম।

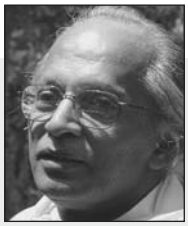

'ফর্মাল বিজ্ঞানের মধ্যে ইনফর্মাল কনটেন্ট যেমন আছে, ইনফরমাল বিজ্ঞানে ফর্মাল কনটেন্টও আছে। কৃষক তো প্রতিদিনই চাষাবাদ করছে ক্ষেতে গিয়ে, ও তো ফর্মাল প্রসিডিওরেই করছে। আমাদের কৃষক মৌখিকভাবে এটা বলে'

শা. চৌ : মার্কসের দর্শনের সঙ্গে এই আধ্যাত্মিকতার সংযোগ ঘটালেন কিভাবে?

ফ. ম : মার্কসের পুঁজি পড়েছি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। মার্কস পড়ে বুঝলাম মার্কস বস্তুবাদী ছিলেন না। আত্মা ও আত্মার বাইরে যে সম্পর্ক আছে তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। যেটা লালন বলেছে। বাংলাদেশ কখনো ভাববাদী ছিলো না। ভাবই বস্তু, বস্তুই ভাব। লালন তো বস্তুবাদী। ভূ-অর্থে যা আছে তাই ভাব। ভাব কথাটার তাৎপর্য অনেক গভীর। একটা আদর্শ ভাব হবে কেন? যা হোক, মার্কসের সঙ্গে এই ভাবের সম্পর্ক করার ফলে বাংলাদেশের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারা বুঝতে শিখেছি। ভাববাদে দেহতত্ত্ব বলে একটা ব্যাপার আছে। দেহতত্ত্ব বুঝলে

অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। দেহতত্ত্ব একটা ভাবের কথা। ভাবনাটা প্রাকৃতিক নিয়মের কথা, মানুষের জন্মের কথা, তার ক্রমোন্নয়নতার কথা, সৃষ্টি রহস্য বলা হয়েছে। প্রজননকে সবাই উৎপাদন হিসেবে দেখেছে। উৎপাদন সে বোঝে, সে উৎপাদককে জীবনের সঙ্গে রিলেট করতে পারে। তাকে আমরা কি শেখাবো?

শা. চৌ : আপনি কি নয়া কৃষি আন্দোলনকে এদের ভাবের সঙ্গে যোগ করে সামনে এগিয়ে নিয়ে চাচ্ছেন...

ফ. ম : শাহাদত ভাই আমি নিজেকে সব সময় শাসন করি। যেমন কৃষক, মরমী সাধক, পাগলের সঙ্গে মিশি কিন্তু সেখানে কোনো জাজমেন্ট নিয়ে যাই না। ওদের সঙ্গে কথা বলার পর নিজের লেখাপড়া দিয়ে মেসেজটা ছেঁকে তোলার চেষ্টা করি।

'নয়া কৃষি পরিবারে বেড়াতে গিয়ে যদি দেখেন খাবার টেবিলে কয়েক পদের তরকারি আছে, তবে বুঝবেন সে আনন্দেই আছে। অর্থাৎ ইন্ডিকেশন তো খুব সহজ। যে কথাটি আমি সব সময় বলতে চেষ্টা করি, আমরা অতীতবাদী নই'

আন্তর্জাতিকভাবে আমি যথেষ্ট পরিচিত মানুষ। কিন্তু কৃষকের সঙ্গে যখন মিশি তখন তার সঙ্গে 'শিক্ষিত' মানুষের মতো কথা বলে লাভ নেই। বরং কৃষক যেভাবে ধান উৎপাদন করে তার সঙ্গে উৎপাদনের মতো করে কথা বলি। আমি আরো বোঝার চেষ্টা করি।

শা. চৌ : আপনি নয়া কৃষি করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন কি না?

ফ. ম : রাষ্ট্রের চেয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বেশি বাধাগ্রস্ত হচ্ছি। দ্বিপাক্ষিক ও ভূপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে সাহায্যপ্রাপ্ত সংগঠনগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা স্বীকার করেছে তারা হার্ডকোর গরিবের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। আমরা দেশে ৫টি এনজিওর একটা। কিন্তু খুব ছোট। কিন্তু প্রমাণ করেছি আমরা সফল। এবং অন্যধারায় যেতে চাচ্ছি। যার জন্য বিদেশী সংগঠনগুলো বাধা দিচ্ছে। সরকারকে বরং বোঝানো সম্ভব। আমরা যারা সমাজের মধ্যে আছি, কাজ করছি সবাই মিলে সুন্দর রাষ্ট্র, সমাজ করতে পারলে অনেক লাভ হয় এটা তো সবাই বোঝে।

শা. চৌ : বিরি'র সঙ্গে আপনাদের পার্থক্য কোথায়?

ফ. ম : আমরা নতুন ৮৭ জাতের ধানের বীজ বিরিকে দিয়েছি। বিরি গতবার আমাদের কোনো বীজ দেয়নি। আমরা বিরি'র সঙ্গে কাজ করতে চাই। তারা এখন আর চাচ্ছে না। কারণ আমাদের সঙ্গে কাজ করলে কানাডাসহ কয়েকটি দেশ গবেষণার জন্য টাকা দেবে না। ফলে বিরি বাধ্য হচ্ছে কাজ না করতে। অস্ট্রেলিয়ার চিক্‌পি কোম্পানি আমাদের ছোলা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি এক লেখায় ওদের ছোলাচোর বলেছি। এই একটি ছোলা অস্ট্রেলিয়াকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয়ের পথ করে দিয়েছে। ফরিদপুরে এ ধরনের ছোলা হয় যেটা সহজে নষ্ট হয় না, পোকায় ধরে না। অস্ট্রেলিয়া এটা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের এই বীজ রক্ষা করতে হবে। এ জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দরকার, অনেকের মধ্যে সেটারই অভাব রয়েছে।

শা. চৌ : কিন্তু পরিবর্তন তো আসছে?

ফ. ম : পুরো সমাজে পরিবর্তন আসছে সত্য। নয়া কৃষিও ছড়াচ্ছে। আমরা তার ফলও পাচ্ছি। আগামী ২ বছরের মধ্যে করমচা, বড় বড় কুল পাবেন- নগরের টবে ব্যালকনিতে আম হবে, আমরা চারা দেবো। এটা বলছি এ জন্য যে এর মধ্য দিয়ে যেমন আয়ের পথ সম্প্রসারিত হবে, সামাজিক বৃক্ষায়নও হবে। সামাজিক অপলিপ্টে কোনো দোষ নেই। কৃষি মানুষ এই কৃষি নিয়ে এগিয়ে যাবে। ইন্ডাস্ট্রি কি দিচ্ছে আমাদের? কয়টা শ্রমিক সৃষ্টি করছে, সামাজিকভাবে কি পরিবর্তন আনছে। যা ঘটছে গ্রামেই ঘটছে। তাঁতি বদলে দিচ্ছে, দিচ্ছে কৃষক। আমার ধারণা কৃষির যে সম্ভাবনা আছে, সেটা নিয়েই আমরা একমাত্র বিশ্ববাজারে দাঁড়াতে পারবো। পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব জ্ঞানের সঙ্গে অন্য জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং ঐক্যবোধ, এক সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছেটা জাগিয়ে তোলা। পরস্পরকে সহায়তা এই জন্যেই নয়া কৃষি। কৃষিই হবে আমাদের মূল ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের জীবনকালেই হবে এটাই আমি আশা করি। সুতরাং এই পরিবর্তনের ধারায় নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে।

শা. চৌ : আমরা সে আশা করি। এখন দু'একটি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আসি। আপনি সম্প্রতি সংবিধান নিয়ে একটি প্রশ্ন তুলেছেন...

ফ. ম : আমি প্রশ্ন তুলেছি বাংলাদেশ বিশ্বে রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশে একটা সংবিধান অ্যাসেম্বলি হয়নি। শাসকরা ভেবেছে সংবিধান ঘরে বসে লেখার কাজ। ৩০/৩২ বছর পর হয়েছে, আমার মনে হয় এই জায়গায় রিভাইজ করার সময় এসেছে আজেবাজে সংশোধনী না এনে। শেখ হাসিনার জায়গায় আমি হলে কখনো সংসদে যেতাম না। কেন যাবো? কারণ ফ্লোর ক্রস করার কোনো সুযোগ নেই। ধরা যাক এখন সবাই মনে করছে মধ্যবর্তী নির্বাচন খুবই জরুরি। বিএনপি'র অনেকে চায়। কিন্তু সে দলের বিপরীতে ভোট দিতে পারছে না। বিরোধীদল যে সংসদে যায় না, সংসদে কোরাম হয় না তার একটি কারণ ফ্লোর ক্রস করা যায় না। যার জন্য এমপির গুরুত্ব সংসদেই নেই। সব নির্ভর করছে একজনের ওপর। সেখানে বিরোধীদল সংসদে কি করবে? তার মানে হলো মূল সমস্যা আমাদের সংবিধানে। আমাদের রাজনৈতিক সংঘাতের মূল কারণ সংবিধান। ফ্লোর ক্রসের সুযোগ থাকলে বাবুল-কাবুলের টাকায় সাংসদ কেনার দরকার হয় না। আমার এই মৌলিক প্রশ্নে বিতর্ক হতে পারে, আমার প্রশ্ন তোলার অধিকার আছে। কিন্তু তা হয়নি, হয়েছে গালিগালাজ! আমার মনে হয় গত কয়েক বছরে শুধু এবিএম মূসার সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে কথা বলেছি। আমি বলি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানাতে হলে সংলাপ থাকতে হবে। মত বিনিময় হবে, বিতর্ক হবে। সংলাপ ছাড়া সমাজ এগুবে কি করে?

শা. চৌ : আমার মনে হয় আপনারা মূল কাজ ছেড়ে মাঝে মাঝে কূট তর্কে জড়িয়ে যাচ্ছেন।

ফ. ম : না, তা নয়। তবে আমি মনে করি অচলাবস্থা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি একমাত্র ডায়ালগের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে পত্রিকার সম্পাদকরা সহায়তা করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সমাজ এগুবে। আমি ভুল করতে পারি। কিন্তু বক্তব্য রাখতে পারবো না? এ ক্ষেত্রেও ডায়ালগের কোনো বিকল্প নেই।

শা. চৌ : আপনার লেখায় দলীয় ঝোঁক থাকে বলে অনেকে মনে করেন।

ফ. ম : এটা দুর্ভাগ্যজনক। গ্রামে দেখি যারা পার্টিজান তারা এভাবে চিন্তা করে। কিন্তু এটা এক সময় কমে যাবে। যে কারণে আমি মনে করি আরও ডায়ালগ সমাজের প্রতিটি সেক্টরে হওয়া দরকার। আমি মনে করি না আমি পার্টিজানের মতো কিছু করি। অনেকেই আমাকে বিএনপিপন্থী বলে ইঙ্গিত করে। কিন্তু '৯৫ সালে এই বিএনপিই আমাকে জেলে পুরেছিল বক্তব্য রাখার জন্যই!

আয়োজন তথ্য সমাবেশ ও অনুলিখন : **সাইফুল হাসান**

আলোকচিত্র : **আনোয়ার মজুমদার**